OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 95
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 89 - 95*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# বাংলা কবিতায় লিঙ্গ বৈষম্য

ড. গুরুপদ অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ
Email ID : gurupada.adhkari2011@gmail.com

***Received Date*** *16. 06. 2024*
***Selection Date*** *20. 07. 2024*

***Keyword***
*Empowerment, Women's Beauty, Girindramohini Dasi, Ishwargupta, Conservative, Sacrifice, Protester, Feminist.*

***Abstract***
*Gender politics is like a terrible infection in society. Men's rights and hegemony are key words. As a result, women have been neglected and oppressed in the society for a long time. They had no right to education, freedom of speech. In particular, women have not had the right to protest against patriarchal empowerment for a long time. Either in society or in literature. Literature is a reflection of social life. Its influence can be seen in Bengali literature especially in poetry. We will try to highlight the issue through the analysis of Bengali poetry of the 19th and 20th centuries.*

**Discussion**

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার/ হে বিধাতা?' — এই প্রশ্ন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আপন শক্তিতে নারীকে বিকশিত দেখতে চেয়েছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। কিন্তু শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজও লিঙ্গবৈষম্য, আজও নির্যাতনের শিকার নারী। প্রতিবাদ ঘটেনি যে তা নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন না ছিল মহিলাদের নির্দিষ্ট ভোটাধিকার, না ছিল তাদের সম্পত্তির কোনো অধিকার, সেই সময় ব্রিটিশ লেখক ও দার্শনিক Mary Wollstonecraft (1759-1797) প্রথম নারীর ভোটাধিকারের কথা বলেন। নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার, শিক্ষা ও উপযুক্ত কাজের পরিবেশের দাবি তোলেন। তাঁর 'A Vindication of the Rights of Women' গ্রন্থটি প্রকাশ পায় ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর বিগত একশো বছরেও ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নারীর ন্যায্য অধিকার স্বীকৃতি পায়নি। বিশেষত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিকার সুরক্ষিত হয়নি। আমাদের দেশে এইসময় নানা আঘাতে, সংস্কারে নারীসমাজ ক্রমশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিশেষভাবে, বাংলায় বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথার জেরে তাদের আত্মপ্রকাশ করা ছিল বেশ দুরূহ। তবু এই সময়, বেশ কয়েকজন রমণী কাব্যচর্চার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশে এগিয়ে এসেছিলেন। এই প্রয়াস প্রখর হয়েছে বিশ শতকের শেষের দিকে। তাই লিঙ্গ রাজনীতির অবস্থান চিহ্নিত করতে আমরা বিগত দুই শতাব্দীর বাংলা কবিতার ভুবনকে বেছে নিয়েছি।

গোটা মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় পুরুষ সমাজেরই আধিপত্য। খনা, রামী, মাধবী কিংবা সপ্তদশ শতকের চন্দ্রাবতী ছাড়া মহিলা কবির সংখ্যা তেমন আর কোথায়? তবে মনসা, চণ্ডী, শীতলা ইত্যাদি নারীদেবীর প্রাধান্য সেখানে বজায় ছিল।

দৈবী পরিমণ্ডল থেকে সরে এসে উনিশ শতাব্দীর বাংলা কবিতায় নারীদের মৌলিক লেখালিখি প্রকাশ পেল। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫-১৯৪৮) প্রমুখ মহিলা কবিরা প্রেম, প্রকৃতি, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে কবিতা লিখতে শুরু করলেন। বৈধব্য, একাকিত্ব, বিষণ্ণতা ইত্যাদি অনুভূতিও তাদের লেখার অন্যতম অঙ্গ ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' কাব্যের নামের মধ্যেই অশ্রুবারির আভাস লুকিয়ে আছে। স্বামীর মৃত্যুশোক, বিষাদকাতরতা, পিতৃহীন শিশুর প্রতি সহানুভূতি সেখানে প্রকাশ পেয়েছে। নারীদের সমকালীন অবস্থা তাঁদের লেখাতে নেই যে তা নয়, গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর প্রথম কবিতাগ্রন্থের নামই ছিল 'কবিতাহার', সেখানে একটি কবিতার নাম 'বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা'। বলাবাহুল্য, উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলায় নারী বিশেষভাবে আলোকপ্রাপ্তা হয়ে ওঠেনি। অশিক্ষা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ইত্যাদি নানা কারণে তারা সমাজে কোণঠাসা ছিল। পুরুষই ছিল ক্ষমতায়ণের কেন্দ্রে। কুসুমকুমারী দাশ নিজে 'আদর্শ ছেলে'-কে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, 'মানুষ হইতে হবে' এই ছিল যার পণ। সেখানে তাঁর লেখাতে 'আদর্শ মেয়ে'-র কথা স্থান পায়নি। উনিশ শতকের গোড়ায় রাসসুন্দরী দেবী (১৮১০-১৮৯৯) যিনি প্রথম নারীর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' (১৮৬৮) লিখেছিলেন, তিনি শ্বশুরগৃহে যাত্রাকালীন নারীদের মনের ভাব লিখতে গিয়ে শ্যামাপূজায় বলীপ্রদত্ত পাঁঠা, 'পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি' ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।[১] সেই সময় ব্রাহ্মণ কুলীন মেয়েদের পরিস্থিতি এবং বিধবাদের দুর্দশা ছিল মারাত্মক। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবি দেখে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) 'বিদায় আরতি' কাব্যের 'দোরোখা একাদশী' কবিতায় লিখেছিলেন,

"উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ
একাদশীর বিধান-দাতা করেন একাদশী,
মুখরোচক এঁর উপবাস, — দমেও ভারী,— অহো!—
পুণ্য ততই বাড়ে যতই এলান ভুঁড়ির কশি!
ওদিকে ওই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী
একাদশীর বিধান পালন করছে প্রাণে মরে,
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁকছে, চোখে সর্ষে-ফুলের সারি,
তৃষ্ণাতে জিভ্ অসাড়, মালা জপ্‌ছে ঠাকুর-ঘরে।"[২]

সামাজিক এই বিধিনিষেধের চাপে নারীদের দুর্ভোগ কতখানি মারাত্মক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সেইসময় নারীরা শিক্ষার যথাযথ অধিকার পায়নি। সামাজিক মেলামিশির ক্ষেত্রেও তাদের ছিল দুস্তর বাধা। জড়তাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল হীনমন্যতাবোধ। কবিতার ক্ষেত্রে প্রথাগত নান্দনিক রীতি তাঁরা মেনে চলেছিলেন। যেখানে তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো অভিনবত্ব স্থান পায়নি। পুরুষের ভাষাতেই তাঁরা কথা বলেছিলেন। পুরুষের লেখার রীতিকেই তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি নিয়ে প্রশস্ত চিন্তাভাবনা, ব্যক্তিগত মতামত তাদের লেখালিখিকে ততটা স্পর্শ করতে পারেনি। তাই নিজেদের পরিবার বা গার্হস্থ্যজীবন চর্চা বা চর্যার মধ্যেই তাদের লেখালিখির গণ্ডি যে সীমায়িত হবে এ নিয়ে আর নতুন কথা কি? এভাবেই পুরুষের ক্ষমতায়ণ বা লিঙ্গ রাজনীতি উনিশ শতকীয় লেখিকাদের কবিচেতনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

পুরুষসমাজ তাদের বাইরে বেরিয়ে আসাটা মেনে নিতে পারছে না। সেবাধর্ম ও দাসত্বের মধ্যেই মেয়েরা আবদ্ধ থাকবে এটাই ছিল তাদের বাসনা। এই রক্ষণশীল সমাজে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন সাহেব বেথুন স্কুল (১৮৪৯) ও বেথুন কলেজ (১৮৭৯) প্রতিষ্ঠা করে বাংলার নারী জাগরণের সূত্রপাত ঘটান। পুরবালারা বিদ্যালয়ে যাবে, লেখাপড়া শিখবে, পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখবে বা সাহিত্যচর্চা করবে, এটা কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বীকৃতি আদায় করতে পারে? মেয়েরা নির্জীব থাকবে এটাই সামাজিক কেতা। তাই অত্যন্ত কদর্য ভাষায় নারীদের আক্রমণ করছেন ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। কবিতাতে তিনি লিখেছেন,

"যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 11*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 95*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

তখন এ বি শিখে, বিবি সেজে,
বিলিতি বোল কবেই কবে।”[৩]

এভাবেই নারীশিক্ষার প্রতি তীব্র অবমাননা প্রকাশ পেয়েছে সংবাদ প্রভাকরের পাতায়।

এমনকি নারীশিক্ষার সমর্থনে এগিয়ে আসার কারণে স্বদেশি বিদ্যাসাগরেরা পুরুষতান্ত্রিক একবগ্‌গা আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি। প্রবল বিদ্রোহী মনোভাব দেখিয়ে এই গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসা কার্যত ছিল অসম্ভব। উনিশ শতকের মহিলা কবি মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) কবিতা লিখলেও সধবাবস্থায় তাঁর কোনো বই প্রকাশ পায়নি। এই অবস্থায় স্বামীর ছায়াবর্তিনী হয়েই তাঁরা দিন কাটাতেন। নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিল সংকোচ। তাঁর সমসাময়িক কবি কামিনী রায়ের প্রথম বই যখন প্রকাশ পায় সেখানে লেখিকার নাম পর্যন্ত ছাপা হয়নি। গিরীন্দ্রমোহিনী ও মানকুমারী দুজনেই অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। লেখালিখির প্রতি সধবা অবস্থায় যে কুণ্ঠা ছিল তা বৈধব্যের পর অবশ্য তারা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বৈধব্যের সময় তাঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। অধিকাংশ নারী সামাজিক শুদ্ধাচার মেনে চলতেন।

উনিশ শতকের কবিতায় নারীকে সামনের সারিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) অবদান কম ছিল না, ১৮৬২ সালে প্রকাশ পেল তাঁর ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’। সেখানে নারীই মুখ্য চরিত্র, সে ব্রীড়াকুণ্ঠিতা বা মৃদুভাষী নয়, বরং, পুরুষচরিত্রগুলি তুলনায় কিছুটা ম্লান। পুরুষের কৃতকর্মের তারা সমালোচনা করেছে, তাদের দোষ-ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলিনিক্ষেপ করেছে। তাদের অব্যক্ত বেদনা সরাসরি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। মধুসূদন অবশ্য ব্যতিক্রম, তিনি নবজাগরণের যোগ্য উত্তরসূরী। এত প্রগলভতার সঙ্গে নারীকে উন্মোচিত করতে এর আগে কেউ এগিয়ে আসেননি। এমনকি তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্যে ইন্দ্রজিতের স্ত্রী প্রমীলা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার সময় অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তবু যেন মনে হয়, বীরাঙ্গনা মূর্তির অন্তরালে স্বামী, শ্বশুরের গরিমাকেই সে মুখ্য স্থান দিয়েছে।

“দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃ -কূল- বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?”[৪]

উনিশ শতকে পুরুষের ক্ষমতায়ণ ও সমাজের নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসার বদলে পরিবারতন্ত্রের মধ্যে নারীরা নিজেদের আবদ্ধ রাখলেন। শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়ম্বদা দেবীর (১৮৭১-১৯৩৫) কবিতায় বিষণ্ণতা, আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি এলো ছোটোদের জন্য লেখালিখি। তাঁদের কবিতায় সামাজিক মঙ্গলাচার, সৌন্দর্যভাবনার প্রতিফলন দেখা গেল। সতীত্বের প্রচলিত সংজ্ঞা তাঁরা মেনে চললেন। সমাজের যা কিছু ইতিবাচক, যা কিছু সুস্থ, সামাজিক, পবিত্র তাকেই তারা নিজেদের লেখার প্রধান বিষয় করে তুললেন। তাই কোনো বিদ্রোহ বা বিপ্লব নয়, সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে একপ্রকার নির্লিপ্তি ও ত্যাগের মন্ত্র তাদের উদ্দীপিত করে তুলল। ‘সুখ’ কবিতায় কামিনী রায় লিখলেন, ‘আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে/আসে নাই কেহ অবনী ’পরে’। তাঁদের লেখালিখিতে আত্মজাগরণের পরিবর্তে এসেছে আত্মবিস্মৃতি।

নারীদের কবিতায় যখন সংসার ও সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি, তখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে নিয়ে নতুন ভাবকল্পনায় মেতে উঠলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ‘জীবনসঙ্গীত’ -এর মতো দার্শনিক কবিতা লিখলেও ‘বাঙালীর মেয়ে’ কবিতায় বাঙালি নারীর আচার-আচরণ, বেশভূষা বা সাজগোজের বর্ণনা তুলে ধরেছেন :

“কে যায়, কে যায় অই উঁকিঝুঁকি চেয়ে?
হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বুলে তামাকুরস- রাঙা রাঙা ঠোঁট,
কলাপে টিপের ফোঁটা, খোঁপা-বাঁধা চুল,
কষেতে রসনা ভরা — গালে ভরা গুল,
বলিহারি কিবা শাটী দুকূলে বাহার

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 11*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 95*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

কালাপেড়ে শান্তিপুরে, কম্মে চুড়িদার,
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যেন ধেয়ে —
হায় হায় অই যায় বাঙালির মেয়ে।"[৫]

নারী মানেই পুরঙ্গনা, সেজেগুজে রাস্তায় পথ হাঁটা নারীর মধ্যে তিনি একধরনের অহংকার প্রত্যক্ষ করেছেন। এ যেন অসহ্য! যেন 'গেল' 'গেল' রব। 'হায়', 'হায়' এর হাহাকারের পিছনে একধরনের গোঁড়ামি কাজ করেছিল। 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) নারীকে 'প্রিয়ে', 'প্রিয়তমে' ইত্যাদি সম্বোধন করে কবিতা লিখেছেন। সেখানে তাঁর প্রণয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। নারীকে প্রণয় প্রকাশ করা সহজ, কিন্তু নারীর আত্মপ্রকাশকে স্বীকার করাটাই সেদিনের সমাজে দুর্লভ ছিল।

উনিশ শতাব্দীর কবিতায় নারীর সৌন্দর্য, নারীপ্রেম ইত্যাদি যেমন পুরুষের লেখা কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি নারীশরীর নিয়ে একধরনের আদিরসাত্মক বা দেহমুখ্য কবিতাও লেখা হতে লাগল। ঢাকার ভাওয়াল পরগণার কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) এইসময় কবিতায় নারীকে কামনার প্রতীক রূপে দেখেছেন ও নিজের আসক্তি প্রকাশ করেছেন, 'আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা', 'দেহের মিলন', 'তনু', 'পূর্ণ মিলন' ইত্যাদি শিরোনামে কবিতা লিখেছেন। যদিও পরবর্তীকালে কবিতায় নয়নের নীরে বাসনাবহ্নি তিনি নির্বাপিত করেছেন। নারীসৌন্দর্য বন্দনা করে লিখেছেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'। পরাধীন দেশকে জননীর রূপে, ধাত্রীরূপে, বঙ্গমাতা রূপে লেখকেরা দেখেছেন, এবং তার বিচিত্র সৌন্দর্যের বর্ণনা তুলে ধরছেন, অন্যদিকে নারীকে ঘিরে লেখা কবিতায় তাঁদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, কামনা- বাসনার উৎসার ধরা পড়েছে। কিংবা, নারীকে দেখা হয়েছে সেবিকা হিসাবে, সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হিসাবে। তুলনায়, নারীদের লেখায় প্রেম বা প্রণয় সংক্রান্ত আদিরস ধরা পড়েনি, পুরুষকে নিয়ে কিংবা দেহজ বিষয় নিয়ে কোনো কবিতা তাঁরা লেখেননি। দেহকেন্দ্রিক কবিতার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ বা সমালোচনাও নারীদের লেখালিখিতে উঠে আসেনি। এককথায়, নারীদের লেখা কবিতার বিষয়বস্তু গতানুগতিক ও নির্দিষ্ট। সেখানে কোনো অভিনবত্ব নেই। তাঁরা ইন্দ্রিয় সম্পর্কের থেকে মানসিক সম্পর্ককেই বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে সেইসব কবিতা হয়ে উঠেছে মুখ্যত রোমান্টিক। সেইসব কবিতা গীতিরসের সুরে রসায়িত। এভাবেই পুরুষ কবিদের পাশে কিছুটা সংকুচিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে কবিতা লিখছেন নারীরা। জাতীয় ভাবধারা, সমকালীন রাষ্ট্রিক সমস্যা, রাজনীতির দোলাচলতা, ধর্মীয় আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় তাঁদের রচনায় সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

এই পর্বে ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, বৌয়েরা কিছু কিছু ব্যাপারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গণ্ডি ভেঙে নিজেদের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এদিক থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কথা উল্লেখ করতেই হয়। এছাড়াও 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) কিংবা তাঁর মেয়ে সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)-র নাম না করলেই নয়। বিশেষত, সরলা দেবী কিছুটা নিয়মভাঙা জীবনের শরিক ছিলেন। তাদের বাড়িতে বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়স বাড়ার আগেই বিবাহ দেওয়াটা ছিল প্রচলিত নিয়ম, সেখানে সরলা দেবী প্রায় তেত্রিশ বছর কুমারী অবস্থায় জীবন নির্বাহ করেছিলেন। তিনি স্বদেশের নারী কল্যাণমূলক নানাকাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন এবং স্বদেশবাসীকে স্বাজাত্যভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বেশ কিছু কবিতা ও স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন। কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমুখ কবিরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু নারীদের লেখা সেইসব কবিতা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তেমন কোনো প্রাণরস সঞ্চার করেনি।

বিশ শতকের গোড়ার পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত পথ থেকে সরে এসে বাংলা কবিতায় যারা নতুন রীতির সন্ধান দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর নাম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মোহিতলাল মজুমদার 'স্মরগরল' কাব্যে (১৯৩৬) নারীকে নিয়ে 'নারীস্তোত্র' রচনা করেছেন। নারীকে যদিও তিনি বলেছেন, 'তুমি নারী, নর-বধূ, তুমি তার দেহ-সহচরী—/ কল্পনার কাম-স্বর্গে তাই তুমি মোহিনী অপ্সরা'। তবু এই কবিতার শেষে তিনি নারীকে প্রণাম জানিয়েছেন,

"নমি সেই মানবীরে—দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা;

চিনেছি তোমারে, নারী, অয়ি মুগ্ধা মর্ত্য-মায়াবিনী।"[৬]

'স্মরগরল' কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত'। বোঝা যাচ্ছে, বিশ শতকে নারী সম্পর্কে পুরুষের অবস্থান বদলাচ্ছে। 'নারী' কবিতায় নজরুল ইসলাম পুরুষের সঙ্গে নারীকে সমানভাবে গুরুত্ব দিলেন।

"সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[৭]

যদিও শিক্ষাদীক্ষায় নারী তখনও পুরুষের থেকে বহু গুণ পিছিয়ে। অবশ্য এর আগেই 'পলাতকা' (১৯১৮) কাব্যের 'মুক্তি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীকে সম্মান দিয়েছিলেন। নারীর জবানিতে তিনি লিখেছেন,

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-তারার নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।"[৮]

বিশ শতকে একই সঙ্গে বাংলা কবিতায় নারীর অমলিন সৌন্দর্য ও তাদের জৈবিক রূপ গুরুত্ব পেয়েছে। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীদের নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাতে আত্মনিবেদনের সুর স্পষ্ট। কল্লোলপর্বের কবিরা নারীকে ভোগের উপকরণ হিসেবে দেখেছেন। যেমন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)-র কবিতা 'যৌবন চাঞ্চল্য' — এ নারীর মুখ ও বুককে আপেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পুরুষদের দিক থেকেই এই জৈব ভাবনার প্রগাঢ় পরিচয় ধরা পড়েছে। তুলনায়, এই পর্বে নারী লেখিকাদের মধ্যে সুনীতি দেবী ছাড়া খুব বেশিজনের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেখানেও তাদের বক্তব্যে কোনও অভিনবত্ব নেই। এই প্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্য লিখেছেন - মেয়েদের মধ্যে কল্পনাশক্তির বিস্তারই ঘটেনি।

"যে ভাষা দিয়ে সে কল্পনা করবে, যে ছবি দিয়ে সে কল্পনা করবে, সেই ভাষা সেই ছবি পুরুষ পোষিত সমাজের, তার সাহিত্যের।"[৯]

তিরিশের দশকে বাংলা কবিতায় যে আধুনিকতার প্রসার ঘটেছে সেখানেও নারী সৌন্দর্য, নারী শরীরকে নানামাত্রিকভাবে দেখার প্রবণতা ধরা পড়েছে। কঙ্কাবতীকে প্রেম নিবেদন করেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'প্রেমিক' কবিতায় কঙ্কাবতীকে সম্বোধন করে লিখেছেন,

"তবু ভালোবাসি।
নতুন ননীর মতো তব তনুখানি
স্পর্শিতে অগাধ সাধ, সাহস না পাই।"[১০]

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) অবশ্য তাঁর পছন্দের নারী বনলতা সেনকে দারুচিনি দ্বীপে খুঁজে পেয়েছেন, পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে তাঁকে সে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। নারীদের তিনি সুরঞ্জনা, সুদর্শনা, শ্যামলী ইত্যাদি নানারূপে দেখেছেন। তারা তাকে আকর্ষণ করেছে। কখনো তাদের দেহী রূপ, আবার কখনো বা প্রকৃতির অসীমতার মধ্যে তারা মিশে গেছে। তবু 'মহাপৃথিবী' কাব্যের 'আদিম দেবতারা' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ নারীর কথা লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন,

"পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে— ব্যবহৃত — ব্যবহৃত — ব্যবহৃত —
ব্যবহৃত হ'য়ে ব্যবহৃত —ব্যবহৃত..."[১১]

কিংবা, 'শঙ্খমালা' কবিতায় নারীর পরিচিতি, "চোখে তার/ যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার!/ স্তন তার/ করুণ শঙ্খের মতো।"[১২] নারীর প্রতি সামাজিক অমর্যাদার চেহারা এখানে স্পষ্ট। বিষ্ণু দে নারীকে কর্মসহচরী এবং ঘরে-বাইরে সর্বত্র

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 11*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 95*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

জীবনসঙ্গিনী হিসেবে দেখেছেন। তিরিশ বা চল্লিশের দশকে মহিলা কবিদের আমরা সেভাবে দেখি না, এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে কবিতা সিংহ (১৯৩১- ১৯৯৮), নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯)-রা কবিতাচর্চায় এগিয়ে এলেন। পরে সত্তর-আশি বা নব্বইয়ের দশকে কৃষ্ণা বসু (১৯৩০-২০২০), মল্লিকা সেনগুপ্ত (১৯৬০-২০১১), তসলিমা নাসরিন (১৯৬২), যশোধরা রায়চৌধুরী (১৯৬৫) প্রমুখের লেখায় নারীর নিজস্ব ভুবন স্পষ্ট ভাষায় উঠে এসেছে।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতায় প্রথম নারীর নিজস্ব ভাষা উঠে আসে কবিতা সিংহের (১৯৩১-১৯৯৮) লেখায়। যেখানে নারীর অত্যাচার, অপ্রাপ্তি ও বেদনা ভাষারূপ পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, নারীর জীবন বড়ো যান্ত্রিক, বড়ো নিষ্প্রাণ। সামাজিক নিষ্পেষণে তাদের সুখ, স্বপ্ন, সাধ, আনন্দ ইত্যাদি ইচ্ছার কোনো মূল্য থাকে না। শেষ পর্যন্ত নিজেকে শেষ করে দিয়ে কঠিন অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যায় নারী। নারীর একাকিত্বকে তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। 'সেই নারী' কবিতায় লিখেছেন,

> "সেই নারী অধোনেত্রে পিছনে জগৎ রেখে স্থির
> পৃথিবীর মত সেই অন্য এক পৃথিবীতে একা
> চলে যাবে মুখ ঢেকে।"[১৩]

কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাংবাদিক। সেই সূত্রে পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির সংকীর্ণ আবর্তে নারীর কঠিন জীবনযন্ত্রণা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'সহজসুন্দরী' (১৯৬৫), 'কবিতা পরমেশ্বরী' (১৯৭৬), 'হরিণা বৈরী' (১৯৮৫) — নামে মাত্র তিনখানি কাব্য লিখেছিলেন কবিতা সিংহ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, লিঙ্গ রাজনীতির আবর্তে, বহুজাতিক সভ্যতার ভিড়ে নারী শুধুই একটা পণ্য। এই পরিবেশ থেকে উদ্ধার করে তিনি নারীর নিজস্ব অধিকার ও প্রতিভার উপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন।

বিশ শতকের ষাটের দশকে নারীবাদের স্বপক্ষে আমেরিকান ফেমিনিস্ট বেটি ফ্রায়ডান (Betty Friedan), জ্যাঁ র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস (Janet Radcliffe Rechards) প্রমুখ নারীবাদীরা লিঙ্গবৈষম্য অবসানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা পালনের দাবি জানান। এই শতাব্দীর সত্তরের দশকে ফ্রান্সে সিমোন দ্য বোভোয়া (Simone de Beauvoir) তাঁর 'The Second Sex' গ্রন্থে নারীকে সমাজে 'অপর' বা 'Other' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এর প্রধান কারণ নারীর শারীরিক গঠন পুরুষের থেকে আলাদা। নারীকে সন্তান ধারণ করতে হয় এবং শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকেও নারী পুরুষের থেকে দুর্বল। এই 'Otherness' নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে সব থেকে বড়ো অন্তরায়। বোভোয়া স্বীকার করেছেন, জন্মের পর যত দিন যায় ততই নারী নিজেকে নারীরূপে সে বুঝতে পারে। যুগ-যুগান্তর ধরে আধিপত্য বিস্তার আর নারী স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে নারীকে বিভাজিত করা হয়েছে। বিশ শতকের সাতের দশক থেকে শিক্ষায়-দীক্ষায় নারীরা ক্রমশ এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই ১৯৭৫ সালেই প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬—১৯৮৫ সালকে নারীদশক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ফলে আশি ও নব্বইয়ের দশকে ইওরোপ-এশিয়ায় সমাজ- রাজনীতির নানাক্ষেত্রে নারীদের ক্রমশ এগিয়ে আসার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা প্রমাণ দিয়েছে পেশিশক্তিতে পিছিয়ে থাকলেও মেধা আর মননে নারীকে কোনোভাবেই দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না।

আশির দশকে নারীর নিজস্ব স্বর অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উঠে এলো মল্লিকা সেনগুপ্তের (১৯৬০-২০১১) লেখায়। মল্লিকা সেনগুপ্তের মতো প্রতিবাদের সুর কারও লেখায় অত তীক্ষ্ণ, অত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। 'নারী-ডট-কম' কবিতায় তিনি লিখলেন, মেয়েদের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা, একদিন যাকে অক্ষরজ্ঞান শিখতে দেওয়া হয়নি, 'তার হাতে আজ কম্পিউটার বিশ্ব'। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও নারীর উপার্জিত অর্থকে মধ্যবিত্ত সংসার স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে চায়নি। 'বউয়ের টাকা সংসারে কোন কাজের?' 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' গ্রন্থে 'নারীর নিজস্ব ভাষা' প্রবন্ধে[১৪] তিনি লিখেছেন, নারীর নিজস্ব ভাষারীতির বড়ো প্রয়োজন, যা পুরুষের শেখানো ভাষারীতিকে অতিক্রম করে এক নিজস্ব স্বরের প্রতিষ্ঠা ঘটাবে। "স্পর্শকাতর সংবেদনশীল প্রতিটি মেয়েই স্বপ্ন দেখে এমন এক ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে যা স্বতন্ত্র, তা তার একান্ত নিজস্ব। ...যে অনুভূতি, যে অভিজ্ঞতা মেয়েদেরই একান্ত, যা নারীশরীর ও নারীমনন ছাড়া অনুভব করা সম্ভব নয়, তাকেই নতুনভাবে উদ্ধার করতে পারে মেয়েরা। সারা পৃথিবীর পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সাহিত্যিক মেয়েরা

এরকম স্বপ্নই দেখছে।”[১৪] একুশ শতকে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় পুরুষের লিঙ্গ রাজনীতির বিরোধিতা করেছেন, পুরুষের দাবাখেলায় তিনি বোরে হতে চাননি। নিজেকে তিনি ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ বলে ঘোষণা করেছেন।

আসলে পুরুষের তুলনায় নারীর পৃথিবী অনেকটাই চাপা, অনেকটাই অপ্রকাশিত। জৈবিক কারণে নারী নিজেকে নির্বাধে প্রকাশ করতে পারে না। এর ফলে একটা দ্বিধা বা সংকোচ, একটা লজ্জায় উনিশ শতাব্দীর নারী নিজেকে গোপন করে রেখেছিল। কাজের জগতে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারায় কোনো আর্থিক স্বাধীনতাও তাদের ছিল না। পুরুষকে তারা ‘পতিদেবতা’ মেনে এসেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর এই সংকোচকে কাজে লাগিয়েছে। নানাভাবে তাদের বঞ্চিত ও নির্যাতন করেছে। মুসলমান সমাজে এর পরিস্থিতি আরও ভয়ানক। নারীর অবস্থান, তাদের জৈবিক ও সামাজিক দূরত্ব ধরা পড়েছে মল্লিকা সেনগুপ্তর সমসাময়িক কবি তসলিমা নাসরিনের (১৯৬২) লেখায়। সেখানে লিঙ্গ রাজনীতির এক ভয়ংকর প্রদাহ উঠে এসেছে। নারীকে নিয়ে তিনি সিরিজ কবিতা লিখেছেন। সেইসব কবিতায় নারীর প্রতি অত্যাচারের কথাই স্পষ্ট। ‘নারী-২’ কবিতায় তিনি লিখেছেন,

> ‘”দেবতা নামক স্বামী লাগায়ে দোরের খিল বক্র চোখে দেখে
> লোভনীয় মাংসময় অনাঘ্রাতা বালিকার সলজ্জ শরীর।
> বহু দেহ বহুবার উন্মোচিত করেছে সে নিষিদ্ধ পল্লীর
> অভ্যস্ত হাতের কালি নারীর কপালজুড়ে ভাগ্যখানি লেখে।”[১৫]

আধুনিক নারীর কণ্ঠস্বরে বারবার নারী ও পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়েছে। পুরুষের ক্ষমতায়ণ বা লিঙ্গ রাজনীতির হাত থেকে মুক্তির দাবিতে উত্তর আধুনিক নারী কবিরা সরব হয়েছেন। তাই মল্লিকার সোচ্চার ঘোষণা,

> “সমাজ পুরুষ ছিল, এইবার উভলিঙ্গ হোক।”[১৬]

## Reference:

১. রাসসুন্দরী, শ্রীমতী, ‘আমার জীবন’, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ২০
২. রায়, অলোক, (সম্পাদিত), সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলিকাতা-৭৩ পৃ. ১৬২
৩. দাশগুপ্ত, শান্তিকুমার, ও শ্রী হরিবন্ধু মুখটী(সম্পা) ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, দত্ত চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা -১২, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১, পৃ. ৪৪৪
৪. দত্ত, সব্যসাচী, (সম্পা), মধুসূদন রচনাবলী, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় প্রকাশ, মাঘ ১৪০৩, পৃ. ৭০
৫. চৌধুরী কামিল্যা, মিহির, (সম্পা), ‘দুই শতাব্দীর বাংলা কবিতা’, বামা পুস্তকালয়, পৃ. ৩২
৬. তদেব, পৃ. ৫৯
৭. ইসলাম, কাজী নজরুল, সঞ্চিতা, পৃ. ৭৪
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ১১
৯. ভট্টাচার্য, সুতপা, ‘কবিতায় নারী, নারীর কবিতা’, পৃ. ৪৪
১০. বসু, বুদ্ধদেব, ‘বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা’, নাভানা, কলিকাতা-১৩, ১৯৬০, পৃ. ১৮
১১. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, (সম্পা), জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশিত- অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র, অবসর, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ. ১৮৭
১২. তদেব, পৃ. ১৫৮
১৩ সিংহ, কবিতা, ‘কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, বৈশাখ, ১৩৬৪, পৃ. ৮৩
১৪. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, ‘স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ’ আনন্দ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, পৃ. ১৬৫
১৫. নাসরিন, তসলিমা, কবিতাসমগ্র, আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২৭
১৬. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, ‘স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০